স্বাধীনতার চেতনায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি নিশ্চিত করতে

চাই আত্মমর্যাদাশীল স্থানীয় এনজিও-সিএসও

‘এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম’- ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার পাশাপাশি বলেছেন মুক্তির কথা। এই মুক্তি ছিলো আমাদের স্বাধীনতার অন্যতম চেতনা। বঙ্গবন্ধু জনগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক মুক্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সোনার বাংলা গড়ে তোলার কথা বলেছেন। ৩০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে, কোটি মানুষের হাজারো ত্যাগের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি, তারও অন্যতম চেতনা এই অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক মুক্তি।

স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিকদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির চেতনা ধারণ করে, সরকারের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে দেশের এনজিও খাত, তথা সুশীল সমাজ সংগঠনসমূহ। বাংলাদেশে ইতিহাস, পরিস্থিতির সঙ্গে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত এনজিও-সিএসও’র বিকাশ এবং ভূমিকা। এই অঞ্চলে এনজিও বা সুশীল সমাজ সংগঠনের আনুষ্ঠানিক যাত্রার প্রারম্ভপর্ব হিসেবে চিহ্নিত করা যায় ১৯৪০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়টিকে। ১৯৪০ এর দশক তিনটি কারণে রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ দশক ছিল: প্রথমত, এটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়; দ্বিতীয়ত, এটি ছিল ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের সমাপ্তি; তৃতীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো- এটি ছিল পাকিস্তানী শাসনের সূচনা যা শেষ পর্যন্ত বাঙালি জাতীয়তাবাদের দিকে ধাবিত হয়। এনজিও বিকাশের দ্বিতীয় পর্ব ১৯৭০ এর দশক। ১৯৭০ ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় এবং ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতার সংগ্রাম এনজিও বিকাশকে ত্বরান্বিত করে। ঘূর্ণিঝড়ে বিপর্যস্ত মানুশের পাশে দাঁড়ায় সুশীল সমাজ, অন্যদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের সুশীল সমাজ, বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীদের ছিলো গুরুত্বপূর্ণ অবদান। বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামে এক হাজার একশত এগারজন শহীদ বুদ্ধিজীবীর হিসাব আছে। তাঁদের মধ্যে ৯৯১ জন শিক্ষক, চিকিৎসক ৪৯ জন, আইনজীবী ৪২ জন, সাংবাদিক ১৩ জন, সাহিত্যিক-শিল্পী-প্রকৌশলী ১৬ জন।

বাংলাদেশে এনজিওদের বিকাশের অন্য আরেকটি পর্যায় ’৮০ এবং ’৯০ এর দশক। ১৯৮০ এর দশকে বন্যায় প্রতি বছর ১.৪৬৪৬ মিলিয়ন টন ফসল নষ্ট হয়েছে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, সময়ের সাথে সাথে, এনজিওগুলি সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে তাদের কাজের ক্ষেত্রকে ক্রমশ বিস্তৃত করেছে। ত্রাণ ও পুনর্বাসনের পাশাপাশি সংস্থাগুলি বিশেষত স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ক্ষেত্রে নানা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সচেষ্ট হয়।

বাংলাদেশের বেসরকারি সংস্থাগুলি বা এনজিও-সিএসও সমূহ জনগণের সর্বাধিক পিছিয়ে পড়া, প্রান্তিক অংশের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে কাজ করছে, ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

আন্তর্জাতিক নানা অবস্থা ও পরিস্থিতির আলোকে স্থানীয় এনজিও- সিএসওকে নানাবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে। স্থানীয় এনজিওগুলো স্থানীয় মানুষের সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে সবচেয়ে বেশি ওয়াকিবহাল, তাই তাদের প্রয়োজনে স্থানীয় এনজিওগুলোই সবার আগে এগিয়ে আসে, স্থানীয় মানুষের কাছে স্থানীয় এনজিওগুলোর দায়বদ্ধতা-জবাবদিহিতা প্রদর্শন করে। স্থানীয় এনজিও-সিএসও স্থানীয় পর্যায়ে তুলনামূলক কম খরচে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। কিন্তু স্থানীয় পর্যায়েও অনেক সময় অনেক কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রত্যক্ষভাবে অনেক বিদেশি এনজিওকে সম্পৃক্ত হতে দেখা যায়।

বলাবাহুল্য যে, উন্নয়ন কর্মসূচি বা মানবিক সংকটে সাড়া দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সকল দক্ষতা-সক্ষমতা স্থানীয় অনেক এনজিও-সিএসও'র নেই, কিন্তু এটাকে অজুহাত বানিয়ে বিদেশি এনজিওগুলোর প্রত্যক্ষভাবে মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নকে জায়েজ যাবে না।

স্থানীয় পর্যায়ে স্থানীয় এনজিও-সিএসও বিকাশে, তাদের স্থায়িত্বশীল করতে বিশ্বব্যাপী দীর্ঘদিন ধরেই নানা উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক-অর্থনৈতিক মুক্তিকে ত্বরান্বিত করতে, স্থানীয় এনজিওগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিয়ে বৈশ্বিক পর্যায়ে নানাবিধ আলাপ-আলোচনা হচ্ছে। স্থানীয় পর্যায়ে বিদেশি বা আন্তর্জাতিক এনজিওদের উপস্থিতিতে স্থানীয়দের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হওয়ার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকায় চার্টার ফর চেঞ্জ, গ্রান্ড বারগেন, পিন্সিপাল অব পার্টনারশিপ ইত্যাদি নানা দলিল, চুক্তিপত্র তৈরি হয়েছে। এসব চুক্তিপত্রে আন্তর্জাতিক এনজিও, জাতিসংঘের অঙ্গ সংস্থাসমূহ ধীরে ধীরে মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়ন থেকে সরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, স্থানীয় এনজিওগুলোকে যথাযথ মর্যাদা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। দু:খজনক হলেও এটা সত্য যে, স্থানীয় এনজিওদের নেতৃত্বে নিয়ে আসার সেসব প্রতিশ্রুতির অনেক কিছুই বাস্তবায়ন থেকে যোজন যোজন দূরে।

বিডিসিএসও প্রসেস বাংলাদেশে স্থানীয় এনজিও-সিএসও বিকাশে, স্থানীয়দেরকে নেতৃত্বের পর্যায়ে দেখার মানসে স্থানীয়করণ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। বিডিসিএসও মনে করে স্থানীয়করণ প্রয়োজন, কিন্তু স্থানীয়করণ বিদেশিরা এসে আমাদের হাতে তুলে দিবে না। এর জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে স্থানীয় এনজিও-সিএসওকেই।

অন্যদিকে, দেশের আর্থ-সামাজিক মুক্তির জন্য কাজ করা এবং প্রান্তিক মানুষের উন্নয়ন সংগ্রামে পাশে থাকার জন্যও স্থানীয় এনজিও-সিএসওকে প্রস্তুতি নিতে হবে। স্থানীয়করণ সম্ভব হলে, প্রয়োজনীয় জাতীয় নীতিগত সহায়তা পেলে স্থানীয় এনজিও-সিএসওসমূহ প্রান্তিক মানুষের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সক্রিয় সারথী হয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়নে, বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে মানুষের কাছে উন্নয়নের বার্তা এবং উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দিতে দারুণ সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে স্থানীয় এনজিও-সিএসও। শক্তিশালী-সক্রিয় এনজিও-সিএসও সরকারের উন্নয়নের বার্তা যেমন প্রান্তিক মানুষের কাছে সহজে পৌঁছে দিতে পারে, তেমনি গবেষণা-সমীক্ষার মাধ্যমে প্রান্তিক মানুষের কথাগুলো, প্রয়োজনের কথাগুলো সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলে পৌঁছে দিতে পারে।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, মানুষের মধ্যে স্বাধীনতা ও মুক্তির চেতনা ছড়িয়ে দিতে স্থানীয় এনজিও ও সুশীল সমাজ যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে, সেটা অব্যাহত রাখতে প্রয়োজন নীতিগত সহায়তা। বিদেশি এনজিও প্রয়োজন অস্বীকার করা যাবে না, কিন্তু কার্যক্রম সীমিত রাখতে হবে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে, তারা নিজেদের দেশ থেকে তহবিল সংগ্রহ করবে- বাংলাদেশে এসে বিদেশি এনজিও তহবিলের জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হলে সেই প্রতিযোগিতা হবে অসমতার, বিদেশি এনজিওগুলো স্থানীয় এনজিওর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতে পারে-পরিবীক্ষণ করতে পারে। সবচাইতে বড় কথা, বিদেশি এনজিও বাংলাদেশে এসে কাজ করবে, তারা স্থানীয়দের কাছে দক্ষতা-প্রযুক্তি হস্তান্তর করবে।

আমাদের স্থানীয় এনজিও-সিএসওদেরকেও নিজেদের আত্মমর্যাদা ধরে রাখতে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, জনগণের প্রতি থাকতে হবে জবাবদিহিতা, নিজের স্থায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করতে এবং নিজের পায়ে দাঁড়াতে সচেষ্ট হতে হবে, কমাতে হবে দাতা সংস্থার মুখাপেক্ষিতা, সরকারের সঙ্গে ইতিবাচক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে সরকারে কাছে প্রান্তিক মানুষের কথাগুলো তুলে ধরতে হবে।

স্বাধীন, আত্ম-মর্যাদাশীল এনজিও সিএসও খাত দেশের আপামর মানুষের মুক্তির জন্যই অপরিহার্য। সংশ্লিষ্ট সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ হবে প্রকৃত দারিদ্র্যমুক্ত, সমৃদ্ধ একটি দেশ- এটাই স্বাধীনতা দিবসের আমাদের কামনা।

BDCSO PROCESS

জাতীয় সচিবালয়

বাড়ি ১৩, সড়ক ২,
ঢাকা-১২০৭